আর্টফাইন, ভল্যুম-০৫, জুন-২০২১, পৃ. ৯৩ - ১১৮

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এদেশের চিত্রশিল্প

তরুন কুমার সরকার*

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ওই বছর দীর্ঘ পরাধীনতার অবসান ঘটে এবং নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭) ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই কালপর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন সময়ে বহুবার বিদ্রোহ করেছে। ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ও ফরায়েজি আন্দোলন, সিপাহি বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন (১৮৫৭) ইত্যাদি আন্দোলন-সংগ্রামে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। ব্রিটিশ শাসনের পর শুরু হয়েছিল পাকিস্তানী শাসন। সাম্প্রদায়িক ও ভ্রান্ত জাতিতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হতে বাঙালিকে এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক চেতনালব্ধ ভাষাভিত্তিক জাতিতত্ত্ব হয়ে ওঠে তার জেগে ওঠার প্রেরণা–যার প্রধান রাজনৈতিক প্রবক্তা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ নামে একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়।

এই লেখায় আমরা মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এদেশের চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার প্রথম পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কালপর্বে এদেশের রাজনীতির বিভিন্ন বাঁকবদল এবং তাতে চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং তারপর এদেশের চারুশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্তু করে যেসব শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এ দেশের চারুশিল্পের বিকাশে কিভাবে ভূমিকা পালন করেছে–এসব বিষয় নিয়ে বিষদ আলোচনা করা হবে। তবে

* **তরুন কুমার সরকার :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নিবন্ধের শুরুতে, প্রেক্ষাপট হিসেবে ১৯৪৭ এর দেশভাগ এবং ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রেক্ষাপট : দেশভাগ ও ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

প্রায় দুইশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে এই দেশ থেকে বিদায় নেয়। এভাবে জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তানের ছিল আবার দুটি অংশ : পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দেশভাগ হয়েছিল ধর্মীয় ভিত্তিতে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে। দেশভাগ নিয়েও এই উপমহাদেশে হত্যা, লুণ্ঠন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিছু কম হয়নি। বলা যেতে পারে, অনেক মৃত্যু আর রক্তপাতের পরই দুটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই দেশভাগ অত্যন্ত গুরুতর ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য।

'৪৭ এর দেশভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে যে ভূখণ্ডটিকে প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেটাই কালক্রমে ১৯৭১ সালে নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে পৃথিবীর মানচিত্রে আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশ নামের যে রাষ্ট্রে আমরা এখন বসবাস করি তার সীমানা প্রথমবারের মতো চিহ্নিত হয়েছিল দেশভাগের সময়। এর আগে এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কোন নজির পাওয়া যায় না। যদিও কোন কোন গবেষক মনে করেন, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের সাথে ১৯৪৭ এর দেশভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

যা হোক, ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে বাঙালি অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু তৎকালীন পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্গত, আর ঘোষিতভাবে পাকিস্তান ছিলো মুসলমানদের জন্য নির্মিত রাষ্ট্র। ফলে সেসময় পূর্ব বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিল। পাশাপাশি, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (বাঙালি ও অবাঙালি), যারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করত, তারা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল। দেশান্তরি এই সব বাঙালি মুসলমানদের ভেতর যেমন পশ্চিম বাংলার মানুষ ছিল, তেমনি ছিল পূর্ব বাংলার মানুষও–যারা বিভিন্ন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করত। দেশভাগের পরের বছর (১৯৪৮) আমরা যখন ঢাকায় প্রথম চারু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে দেখি তখন এই উভয় শ্রেণির বাঙালিকেই আমরা সক্রিয় হতে দেখি। তবে এর নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব বাংলার শিল্পী জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬)। জয়নুল আবেদিন ততদিনে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা এঁকে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি ছাড়া

আরো যাঁরা ঢাকায় চারু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার আন্দোলনে তাঁর সতীর্থ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন আনোয়ারুল হক (১৯১৮-১৯৮০), সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮) প্রমুখ।

দেশভাগের আগে ঢাকায় চারু-চর্চার কোন প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছিল না। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান শিল্পীরা, যাঁরা দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় চলে এসেছিলেন, তাঁরা ঢাকায় একটা আর্ট স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এঁদের নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদিন। শিল্পীরা ছাড়াও তৎকালীন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ এই আন্দোলনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। যেমন অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, আবদুল গনি হাজারী, সরদার জয়েনউদ্দিন প্রমুখ। আবার প্রশাসনের একটা অংশও ঢাকায় চারু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। যেমন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা, আবুল কাসেম, সলিমুল্লাহ ফাহমী প্রমুখ। তারপরও যখন জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় চারু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়–সেটা তখন খুব সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। ধর্মীয় ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি সেখানে চারু-চর্চার অনুকূল অবকাঠামো ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৪৮ সালের পোস্টার প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে। সেই পোস্টারগুলোর বিষয়বস্তু ছিল ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী। আমাদের দেশের দুই দিকপাল শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও শিল্পী কামরুল হাসান এই পোস্টারগুলো আঁকায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৩১; হক, ২০০৪, পৃ. ১৮; হক, ১৯৯৮, পৃ. ৬০ ও ২৪৩)। উল্লেখ্য, এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল মূলত তৎকালীন পাকিস্তানের আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য যারা ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল।

এই পোস্টার প্রদর্শনীর বদৌলতে, যখন পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতম মহল (ক্ষমতাকাঠামো) দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ছবি আঁকার একটা ব্যাবহারিক দিক আছে; যা কিনা প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, তখন ছবি আঁকার স্কুল তৈরি অনেক সহজ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হলো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট (১৯৪৮) যা এখন চারুকলা অনুষদ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের আধুনিক চারুশিল্পের ইতিহাস, মনে করা হয়, এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এখনো, এদেশের যাবতীয় চারুকলা বিষয়ক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এই প্রতিষ্ঠানটি যার জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষমতাকাঠামোকে খুশি/তুষ্ট করার জন্য ইসলাম ধর্মকে এবং রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে আঁকা শতাধিক পোস্টারের একটি প্রদর্শনী।

কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, গোড়া থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে–বিশেষ করে চর্চায় ও অনুশীলনে ধর্মীয় বিষয়কে কখনোই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। নেতিবাচক বা সংকীর্ণ অর্থে যেটাকে ধর্মীয় 'সাম্প্রদায়িকতা' বলা হয় তা এই প্রতিষ্ঠানে প্রশ্রয় পায়নি। বরং এই প্রতিষ্ঠানের আদিপর্বের শিক্ষকদের অনেককে বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দেশজ উপাদানের দিকে আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের নাম উল্লেখ করা যায়। পাশাপাশি আদিপর্বের শিক্ষকদের ভেতর ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদের প্রভাবও লক্ষ করা যায়, যা তাঁরা বহন করে এনেছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভের সুবাদে। আবার অনেকে এই দুটি ধারার মিশ্রণের চেষ্টাও করেছেন। পাশাপাশি আদিপর্বের শিক্ষার্থীদের অনেকে বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। যেমন মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। বাম রাজনীতির একটা প্রভাব গোড়া থেকেই চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত ছিল।

১৯৪৮ সালে পুরানো ঢাকার এই ভবনের দুটি কক্ষে যাত্রা শুরু করেছিল গভর্মেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট

ফলে ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে, পাকিস্তানী শাসনামলের গোড়ার দিকেও, বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ও লালনের জন্য যেমন একধরনের অনুকূল পরিবেশ বা

প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল, তেমনি একধরনের আন্দোলনের সংস্কৃতিও দানা বেঁধে উঠছিল–এরকম বলা যায়। তবে বাঙালি সংস্কৃতির জন্য ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের এই পক্ষপাত এবং আন্দোলন সম্পৃক্ততা প্রথম প্রকাশ্য রূপ লাভ করে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ : চারুশিল্পীদের অবদান

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিন পর থেকেই (১৯৪৮) রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিতর্ক ও আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মও এই বছর। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন তীব্র ও গতিশীল হয়ে ওঠে ১৯৫২ সালে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলত ছাত্ররা। যদিও তখন ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট শৈশব অতিক্রম করেনি তবু এই ইনস্টিটিউটের তৎকালীন ছাত্র-শিক্ষকরা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিভিন্নভাবে যারা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন (১৯২৫-২০১১), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও বিজন চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রহমান ভুইএঞা প্রমুখ বিভিন্নভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায় (আকন্দ, ২০০৯, পৃ. ১৭)।

এছাড়াও শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের কথা জানা যায়। তখন তিনি ছিলেন স্কুলের ছাত্র। থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। তারপরও তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, তখন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই প্রধানত পোস্টার লিখত। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটের অনেক ছাত্রও পোস্টার, ব্যানার লিখতে শুরু করে। তিনি লিখেছেন,' সেকালের পোস্টার লেখার প্রধান মালমসলা ছিলো পুরাতন খবরের কাগজের ওপর লাল বা কালো রং দিয়ে লেখা শ্লোগান। সাধারণত রাজনৈতিক কর্মীরাই সেগুলো লিখতেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রথম আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, রশীদ চৌধুরী পোস্টার লিখেছেন। এঁদের তুলির বলিষ্ঠ রেখার পোস্টার শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তায়, গলিতে সেঁটে দিয়ে ভাষা আন্দোলনেকে করা হয়েছে আরো প্রাণবন্ত। এছাড়া লেখা হয়েছে শ্লোগানে, দাবীতে আকীর্ণ ব্যানার। আমি নিজেও আমার ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলাম।' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৫-১৮৬)।

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্য নির্ধারিত দিন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রদর্শনীর কাজও এগিয়ে

চলছিল। তৎকালীন নিমতলীর ঢাকা জাদুঘরে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করার কথা ছিল বাংলার গভর্নরের পত্নী ভিকারুননেসা নূনের। ২১ তারিখে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলি চালানো ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কামরুল হাসান। কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে সেসময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় : ‘তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে হবে। হঠাৎ দেখি শিল্পী মুর্তজা বশীর। সারা জামা তার রক্তাক্ত। সে খুবই ভাবপ্রবণ। আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে পড়ল। সালাম, বরকতদের সংবাদ আমি বশীরের কাছ থেকেই প্রথম পেয়েছি। বশীর হাসপাতালে আহত ও মৃতদের বহনকারীদের সঙ্গে ছিল। তার গায়ের জামায় তাদেরই তাজা রক্ত (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৭)।’

পাশাপাশি, মুর্তজা বশীরের লেখা থেকেও সেই সময়কার প্রত্যক্ষদর্শীর তাজা বিবরণ পাওয়া যায়। জানা যায়, মুর্তজা বশীরসহ আরো কয়েকজন শিল্পী প্রদর্শনী থেকে তাদের ছবি প্রত্যাহার করেছিলেন তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হিসেবে। অবশ্য পরে, যখন মার্চ মাসে এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় তাতে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন। উদ্বোধন করেছিলেন লেডি ভিকারুননেসা নূন। আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাতে আলোড়িত হয়ে ‘হিউম্যানিটি ক্রুসিফাইড’ শিরোনামে একটা বেশ বড় ছবি এঁকে এই প্রদর্শনীতে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ছবির সিলেকশন কমিটি ঐ মুহূর্তে এধরনের ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়া সমীচীন বোধ করেনি। (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৪৪)।

ভাষা আন্দোলনের পরের বছর (মার্চ ১৯৫৩) শহীদ দিবস স্মরণে *একুশে ফেব্রুয়ারি* নামে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল (প্রকাশক : মোহাম্মদ সুলতান) তার প্রচ্ছদ করেছিলেন আমিনুল ইসলাম। আর এই সংকলনে অলংকরণ করেছিলেন মুর্তজা বশীর ও অন্যান্য কয়েকজন শিল্পী। মুর্তজা বশীরের লিনোকাট মাধ্যমে করা শিল্পকর্মে দেখা যায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। গুলিবিদ্ধ তরুণের আহত শরীর আঁকড়ে ধরে আছে আরেক তরুণ সহযোদ্ধা। আহত তারুণ্যের হাতে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে প্ল্যাকার্ড। এছাড়াও এই সংকলনে আরো যেসব অলংকরণ রয়েছে তাতে একুশের অভিজ্ঞতার তাজা বিবরণ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

’৫২ সালের ঐতিহাসিক ঘটনার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা একুশের ঘটনা স্মরণে ব্যানার, ফেস্টুন শোভিত একটি শোভাযাত্রা বের করেছিল। এই শোভাযাত্রায় ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে আঁকা একাধিক ব্যানার প্রদর্শিত হয়েছিল। এই সব ব্যানারচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত

ভাষার দাবিতে ছাত্রদের মিছিল এবং তাতে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা। সেই সাথে 'বাকস্বাধীনতা চাই', 'গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করো'– এইসব স্লোগান সমৃদ্ধ সচিত্র প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন তাঁরা বহন করেছিলেন।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত
একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনের অলংকরণ, ১৯৫৩

ভাষা আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে শহীদ মিনারের কথা বলা যেতে পারে। হামিদুর রাহমান ও নভেরা আহমেদের পরিকল্পনা ও ডিজাইনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে (১৯৫৬-১৯৫৮)। যদিও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে একাধিকবার এই শহীদ মিনার তৈরির কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং শিল্পীদ্বয়ের পরিকল্পিত নকশা অনুসারে এই কাজ কখনো সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। তবু এই শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকেই। যা তখন থেকে এখন পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্মারক ও প্রেরণার উৎস। অতঃপর এই মডেলের অনুসরণে অজস্র অসংখ্য শহীদ মিনার গড়ে উঠেছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল বলা যেতে পারে। এর প্রভাব দেখা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাত বছর পর প্রথম

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবছর। '৫৪ -এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট -এর জয়লাভ ও মুসলিম লীগের ভরাডুবি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই নির্বাচনে চারুশিল্পীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। কামরুল হাসানের লেখা থেকে জানা যায়, '১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দানের ভিত্তিতে শিল্পীরা যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হাজার হাজার দেয়ালচিত্র, ব্যানার এবং ছবি এঁকেছিল তা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯০)।' নমুনার অভাবে কেমন ছিল সেসব দেয়ালচিত্র বা ব্যানারের চিত্রভাষা–তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রবীণ শিল্পীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, সেসময়ের কাজগুলো ছিল মূলত নির্বাচনমুখী। রাজনৈতিক নেতাদের অনিয়ম ও দুর্নীতি (যেমন ঘুষ নেওয়া), পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হতো এই সব পোস্টার, ব্যানার বা দেয়ালচিত্রে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ অবলম্বনে এই সব কার্টুন আঁকা হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি এবং আর্ট কলেজের আরো কয়েকজন ছাত্র এই সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (আকন্দ, ২০০৯, পৃ. ২১)।

ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ভেতর যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে চারুশিল্পীরাও উজ্জীবিত হয়েছিলেন। এবং জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল সে সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এ উপলক্ষে ঢাকা এসেছিলেন। এবিষয়ে কামরুল হাসানের মূল্যায় ও স্মৃতিচারণ প্রণিধানযোগ্য, 'আমার বিবেক-বিবেচনা দিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে এসে আজ এটা পরিস্কার উপলব্ধি করতে পারছি যে '৫৪ সালের এ সাহিত্য সম্মেলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভিক প্রবাহ। এ প্রবাহ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পেরেছিল। প্রমাণ পাওয়া যাবে যে এর সেই সময়কার "দৈনিক আজাদ" পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রায় দুই মাস ধরে আজাদের পৃষ্ঠায় দুই কলাম হেডিং-এ প্রতিদিন আমাদের এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষপ্রসূত বিষোদগারই ছিল না, এতে অশালীন ভাষাও প্রয়োগ করা হতো। আমরা অর্থাৎ সম্মেলনের উদোক্তা ও সমর্থকরা যে ভারতীয় দালাল এবং ইসলামবিরোধী এটাই ছিল তাদের মূল বক্তব্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পী কেবল সেই মহাসম্মেলন উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী করেই দায়িত্ব পালন করেনি বরং পোস্টার, পুস্তিকা, মঞ্চসজ্জা থেকে ছায়া নাট্যের পটভূমিতেও সক্রিয় ছিল (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯১)।' এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান হাউসে যে আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তা উদ্বোধন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

এছাড়া, ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে (১৪-২১) আর্ট কাউন্সিলের আয়োজনে জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে চারুকলা ইনস্টিটিউটে লোকশিল্পের এক বিশাল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত সেটাই ছিল বাংলাদেশে প্রথম লোকশিল্প প্রদর্শনী। সারা দেশ থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল নকশিকাঁথা, শিকা, জামদানি, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিস, ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের উপকরণ ইত্যাদি (দৈনিক আজাদ, ১৬ আগস্ট, ১৯৫৫)। সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও এই প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল—যা পরোক্ষভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সহায়তা করেছিল।

পঞ্চাশের দশকেই ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ছাড়াও বিদেশি অনেক প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। কামরুল হাসানের ব্যবস্থাপনায় এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সন্তোষের রাজবাড়িতে। আর্ট ইনস্টিটিউটের ৩০ জন ছাত্র এতে অংশ নেয়। কাগমারী এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে প্রদর্শনীর আগে তাৎক্ষণিকভাবে এসব চিত্রকর্ম আঁকা হয়েছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে যে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে তৎকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

তবে বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে ষাটের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা ষাটের দশকেই নানাভাবে আরো স্পষ্ট ও প্রকাশিত হতে শুরু করে।

১৯৬২ সালে যখন ছাত্রদের নেতৃত্বে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল—তখন প্রায় একই সময় সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৬২ সাল নাগাদ এই আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নামের সঙ্গে 'ইনস্টিটিউট' শব্দটি যুক্ত থাকলেও ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটটি সরকারি কাগজপত্রে স্কুল হিসেবেই পরিগণিত হতো। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি স্কুলের অনুরূপ ছিল। তখন এখানে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল। অর্থাৎ এখানে শিক্ষা লাভ করলে একজন শিক্ষার্থী যে সার্টিফিকেট লাভ করতেন তা ডিগ্রির সমতুল্য ছিল না। ষাটের দশকের গোড়ায় যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁরা সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে ডিগ্রি প্রদানের দাবিতে এই চারু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত করার আন্দোলন শুরু করেন। ছাত্রদের ভেতর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব

দেন আনোয়ার হোসেন, প্রফুল্ল রায়, কেরামত মওলা. সামসুল ইসলাম নান্টু, মুনশী মহিউদ্দিন, বেলাল আহমেদ, আর. এস. এম সালাম প্রমুখ। এছাড়াও আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই কমবেশি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আর্ট ইনস্টিটিউটের বাইরের অনেকের সহযোগিতাও পাওয়া যায় এই আন্দোলনে। এ প্রসঙ্গে কমরেড রবি নিয়োগী, কমরেড মোহম্মদ ফরহাদ, কবি বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন ডাকসুর নেতৃবর্গও এই আন্দোলনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তবে এই আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তৎকালীন তরুন শিক্ষক শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। বিভিন্ন কার্টুন সমৃদ্ধ পোস্টারগুলোর মাস্টার কপিটি তিনিই অঙ্কন করতেন। শিক্ষার্থীরা সেগুলোর অসংখ্য কপি করে সারা শহরে ছড়িয়ে দিত। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার জানিয়েছেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছিলেন যে, কার্টুন বা ছবি আঁকা দিয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলনেও তিনি বিভিন্ন বক্তব্যসমৃদ্ধ কার্টুন আঁকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন (আকন্দ, জুন ২০০৯, পৃ. ৪৫)।

এই আন্দোলনের ফলে প্রায় ৬৬ দিন (মতান্তরে ৬২ দিন) ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকে। সরকারি কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে ছাত্রদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত আটজন ছাত্রকে এই আন্দোলনের কারণে রাসটিকেট করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের পর সরকারের তরফ থেকে দাবি মেনে নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে সরকারি আর্ট কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে 'সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে এবং ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি চালু হয়। আর্ট কলেজে রূপান্তরিত করার এই আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। যদিও মূলত ছাত্ররাই এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল, তবু এটি ছিল পেশাজীবী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের চারুশিল্পীদের প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন, তৎকালীন ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে প্রথম প্রকাশ্য বিরোধ–যা ছিল অভূতপূর্ব। এই আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক ও চারুশিল্পীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় হলেও তার সঙ্গে রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু জড়িয়ে ছিল। বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতর বৈষম্যনীতি এবং সরকারের বিভিন্ন আচরণের প্রতি ক্ষোভ এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলত এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে চারুশিল্পীরা পূর্ব বাংলার বিশেষ পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরো পাকাপোক্ত করার দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

আইয়ুব খানের শাসনামলের প্রথম কয়েকবছর তেমন কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্রমশ বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫৯ সালে জারিকৃত 'দি পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (পোডো), 'দি ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অধ্যাদেশ' (এবডো) এবং একই বছর জারিকৃত 'দি বেসিক ডেমোক্রেসি অর্ডার' কিংবা ১৯৬০ সালে জারিকৃত 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশ' ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বিরোধীপক্ষের কণ্ঠরোধ এবং নিজের ভিতকে পাকা করার চেষ্টা করেছিলেন। এসব অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বন্দি কিংবা নাজেহাল করার পাশাপাশি সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের শুরু থেকেই আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঝিমিয়ে পড়া রাজনৈতিক অঙ্গনে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। ক্রমশ তা রাজনৈতিক চেহারা নেয় এবং আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়।

এই আন্দোলনেও বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় ও উজ্জ্বল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই কার্টুন বা ছবি এঁকে পোস্টার, ফেস্টুন বা ব্যানার করার যে চল তৈরি হয়েছিল তা ষাটের দশকের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে আরো বৃদ্ধি পায়। আর্ট কলেজ করার আন্দোলনে যেমন শিল্পীরা এই পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করেছিল, তেমনি জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতেও তারা চিত্রিত পোস্টার, প্ল্যাকার্ড বা ফেস্টুন তৈরি করার ধারা অব্যাহত রাখে। সেই সময়ের একটি আলোকচিত্রে দেখা যায় শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে একটি মিছিলের প্ল্যাকার্ড ও পোস্টারগুলোতে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'গণতন্ত্র কায়েম কর', 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর' ইত্যাদি স্লোগানের পাশাপাশি শেকল ছিঁড়ে বের হয়ে আসছে গতিশীল মানুষ এমন ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গচিত্র স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মিছিলে যেসব পোস্টার, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি দেখা যায় তা চারুশিল্পীদের অবদান।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে দুটি বড় ঘটনা ঘটে। প্রথমত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে আইয়ুব খানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সম্মিলিত বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ। ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। যদিও ফাতেমা জিন্নাহ এই নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে পরাজিত হন। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে যায় যে আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমহ্রাসমান। দ্বিতীয়ত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পূর্ব পকিস্তানে এই যুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছিল। এ যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ভৌগোলিক হুমকির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে এবং নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে বাস্তবভিত্তিক যুক্তি জুগিয়েছিল। এছাড়াও যুদ্ধ চলাকালীন রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ এবং পশ্চিম বাংলা থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান ও

প্রকাশনা আমদানি নিষিদ্ধকরণ বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের ওপর আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

এসব কারণে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো বিকশিত হতে থাকে। এর নানা নজির আমরা দেখতে পাই সেসময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। উদাহরণ হিসেবে ছায়ানটের কথা বলা যেতে পারে (প্রতিষ্ঠা ১৯৬১)। ১৯৬৪ সাল থেকে ছায়ানট রমনা বটমূলে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বর্ষবরণ উৎসব উদযাপন করতে শুরু করে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে। পাশাপাশি, আমরা দেখি আর্ট ইনস্টিটিউটেও ছবি আঁকার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হতে। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের গোড়াতেই এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যাতে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনৈতিক প্রমুখ বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষের ভেতর একধরনের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। তাদের এই সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি ছিল আইয়ুববিরোধী মনোভাব ও বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনা। এই বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনাই ক্রমশ পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৬৬ সালে।

১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা প্রস্তাব হাজির করেন। এই সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত না হলেও পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ছয় দফা প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হবার মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। ছাত্র বুদ্ধিজীবী ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে ছয় দফা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। এই ছয় দফার কারণেই শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা এবং শীর্ষ নেতার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

ছয় দফা এবং শেখ মুজিবের এই জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে আইয়ুব খানের সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক ও ছাত্র-জনতার ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। সংবাদপত্রগুলোর ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ১৯৬৬ সালেই শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে যান এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময় কারাবন্দি থাকেন। তারপরও সারা দেশে জোরদার আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। অবশেষে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ঘটে।

ইতিহাসে এটাই ’৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিব ও অন্যান্য বিরোধী নেতাদের আইয়ুব খান বিনা শর্তে মুক্তি দেন। পরের মাসে মার্চে পরিস্থিতি সামলাতে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয় গোলটেবিল বৈঠক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন না। মার্চ মাসেই সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আইয়ুব খান দায়িত্ব পরিত্যাগ

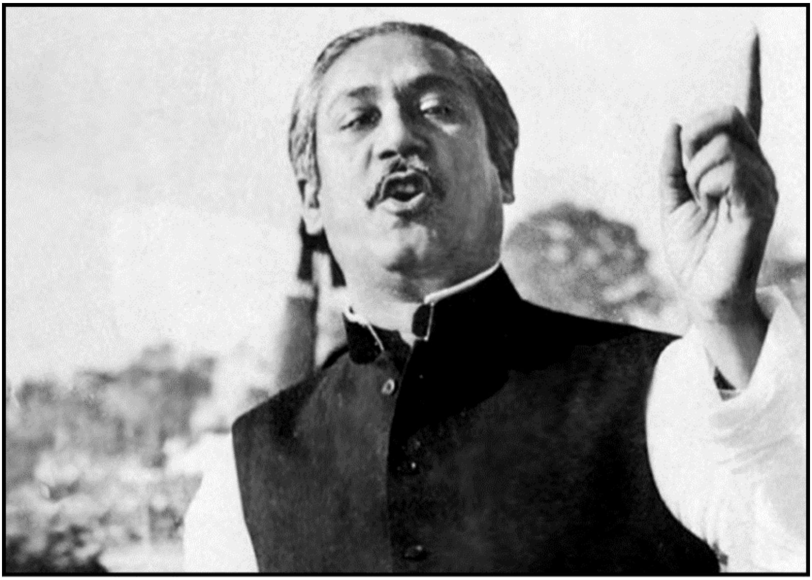

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

করেন। এভাবে দশ বছরব্যাপী আইয়ুব খানের শাসনামলের অবসান হয়। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয় এবং সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান নিজেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে দেশ এক সেনা শাসকের হাত থেকে আরেক সেনা শাসকের হাতে এসে পড়ে।

বস্তুত এই হলো ১৯৬৬-৬৯ এই কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই কালপর্বে প্রথমে ছয় দফা এবং পরবর্তীতে এগারো দফাকে সামনে রেখে যখন স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাতে চারুশিল্পীরা বিভিন্নভাবে অংশ নেয়। চারুশিল্পীদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। শহীদ মিনারে আলপনা করার প্রচলন আগে থেকেই ছিল।

কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকে তা আরো নতুন মাত্রা পায়। বাঙালি সংস্কৃতি ও আন্দোলনের সপক্ষের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বড় বড় ছবি বা ব্যানার এঁকে তা টাঙিয়ে দিয়ে ব্যানার প্রদর্শনী শুরু হয় শহীদ মিনার এলাকায়। ক্রমশ এই ব্যানার প্রদর্শনী জনপ্রিয়তা এবং ব্যাপকতা লাভ করে। '৬৭তে শুরু হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে অর্থাৎ ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে তা আরো বড় আকারে আয়োজিত হয়। আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গঠনে এই ব্যানারগুলোর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কী ছিল এই সব ব্যানারের ছবির বিষয়বস্তু? ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের ভাষ্য থেকে সেই সময়ের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, '... ঐ সময় প্রথম প্যানেল করার প্রয়াস পাই বাঙালি জাতিসত্তার উপর। বাঁশপাতার কাহিনী বলে একটা বড় ব্যানার করা হয়। ঐ ব্যানার অসাধারণ সুন্দর ছিল। অনেকগুলো অংশে এটা বিভক্ত ছিল। মা ও শিশু...হারিকেনের আলোয় পড়ছে। আকাশে চাঁদ। অ, আ, ক, খ পড়ছে। তারপর দেখা যায় ছেলেটা বড় হয়েছে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে লেখে। আরো একটু বড় হয়ে ছেলেটা স্কুলে যায়। আর অবসর সময়ে সে রাখালদের সঙ্গে গরু চরায় বা রাখালের বাঁশী শোনে। তারপর একসময় ছেলেটা মাট্রিক পাস করলো। বাবা ভাবলো তার সন্তান বড় হয়েছে। শহরে পাঠাবে লেখাপড়া করতে। সেই ছেলে শহরে এসে যখন দেখলো সে যে ভাষায় কথা বলে, লিখতে শিখেছে, সেভাষায় কথা বলা যাবে না। তখন সে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। একসময় পুলিশের বাঁশের লাঠির আঘাতে সে মারা যায়। এই কাহিনীচিত্র সে সময় অসাধারণ ছিল (খালিদ, ২০০৫)।'

প্যানেল চিত্র ছাড়াও আরো অনেক ব্যানারচিত্র আঁকা হয়েছিল সেসময়। এর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ হলো দুঃখিনী বর্ণমালা (মতান্তরে বিক্ষুব্ধ/বিদ্রোহী বর্ণমালা)। বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ছড়াকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য দর্শকের সামনে হাজির করা হয়েছিল চিত্রকলার মাধ্যমে। যেমন 'অ'তে 'অজগর আসছে তেড়ে' এটা খুবই প্রচলিত শিশুতোষ বাক্য। এই শিশুতোষ বাক্যকে কাজে লাগিয়ে যে ছবি আঁকা হয়েছিল– তা কিন্তু পুরোপুরি রাজনৈতিক। এই ছবিতে দেখা যায় বিশালাকৃতির এক অজগর– যেটা চালিয়ে বা বহন করে নিয়ে আসছে কয়েকজন পাকিস্তানি পোশাক পরা হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। অজগরের হিংস্রতা থেকে এদের হিংস্রতাও কম নয়। এই ছবিতে যে লেখা ব্যবহার করা হয়েছে তাও গুরুত্বপূর্ণ–'দেশ স্বাধীন হলো। বিদেশীরা গেল চলে, কিন্তু স্বার্থন্বেষীর পোষা অজগর এলো, ধীর গতিতে লোভের জিভ বের করে।' এই ছবির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। এই ধরনের আরো অনেক ছবি আঁকা হয়েছিল এবং তা প্রদর্শিত হয়েছিল শহীদ মিনার চত্বরে।

আবার, রশীদ চৌধুরীর আঁকা একটা ব্যানারে দেখা যায় বাংলার মানুষসহ বাংলার বাঘ, কুমির, গরু, সাপ ইত্যাদি পশু-পাখি, এমনকি ফুল, লতাপাতা এবং প্রজাপতি–

সবাই একসঙ্গে বিদ্রোহ করেছে। বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি যে বিদ্রোহ-উন্মুখ তা এই ছবিতে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। আবার নাম না জানা কোন এক শিল্পীর আঁকা একটি ব্যানার চিত্রে দেখা যায় চার দিক থেকে এগিয়ে আসা বেয়নেটের আক্রমণের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যানার– শহীদ দিবস অমর হোক।

এই সব ব্যানারচিত্র আঁকার কাজে যারা অংশ নিয়েছেন কিংবা সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে মুস্তাফা মনোয়ার, ইমদাদ হোসেন, হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদাত চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মঞ্জুরুল হাই, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, প্রফুল্ল রায়, মতলুব আলী, আনোয়ার হোসেন, মহিউদ্দিন ফারুক, আবুল বারক আলভী, বীরেন সোম প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ। আর শিল্পীরা শুধু ছবি এঁকে নয়, আরো নানাভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। এভাবে দেখা যায় যে, '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের শিল্পীরা আন্দোলনে শরিক হয়েছেন বিভিন্নভাবে, তবে শিল্পী হিসেবে রঙ-তুলি হাতেই তাঁরা অধিক সক্রিয় ছিলেন।

এছাড়া উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে কামরুল হাসান বাংলা একাডেমীতে প্রথম 'অক্ষরবৃক্ষ' উদ্বোধন করেন। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তার করা বাংলা অক্ষর দিয়ে শাড়ির নকশা উনসত্তরে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাছাড়া এসময় কামরুল হাসান নিজের উদ্যোগে প্রচুর পোস্টার এঁকেছেন বলে জানা যায়। উনসত্তরেই তিনি আঁকতে শুরু করেন ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি–যা আরো পরে পোস্টার হিসেবে ছাপা হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৪)।

১৯৭০ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকার বাঙালি শিল্পীদের নিয়ে 'নবান্ন' শীর্ষক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া ১৯৭১ সালে তিনি ময়মনসিংহের এক জনসভায় পাকিস্তান সরকারের দেওয়া 'হেলাল-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন করেন। যে আন্দোলনের সংস্কৃতি চারুকলা ইনস্টিটিউটে গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে তার ফলশ্রুতিতে মার্চ মাসে চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল সেসময়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এই পরিষদের ব্যানারে প্রথমবারের মতো 'স্বাধীনতা' শব্দটি লিখে মিছিল বের করা হয়েছিল–যা ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। এর কয়েকদিন পরই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। এবার আমরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকলীন ও পরবর্তীকালের চিত্রকলা নিয়ে আলোকপাত করবে।

মুক্তিযুদ্ধের চিত্রকলা, চিত্রকলায় মুক্তিযুদ্ধ

আমরা সবাই জানি, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য, বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সামরিক বাহিনী নৃশংস অভিযান চালায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর। এই কালরাত্রির পর আলোচনার সব

পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম–যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

স্বাধীনতার জন্য বাঙালির নয় মাসব্যাপী এই মুক্তিযুদ্ধে চারুশিল্পীরা অনেকে সরাসরি রাইফেল হাতে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন–শিল্পী শাহাবুদ্দিন, শাহাদাত চৌধুরী প্রমুখ। অনেকে গোপনে গেরিলাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী আবুল বারক্ আলভী অন্যতম। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রবাসী সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'আর্ট ও ডিজাইন বিভাগ' গড়ে ওঠে। এই বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। এছাড়াও এই বিভাগে যুক্ত ছিলেন শিল্পী নিতুন কুন্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, শিল্পীদের বীরেন সোম প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অসাধারণ সব পোস্টার তৈরির কৃতিত্ব মূলত এইসব শিল্পীদের। বিশেষ করে, কামরুল হাসানের আঁকা দানবরূপী ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি 'এই জানোয়ারদের হত্যা

শিল্পী কামরুল হাসান

করতে হবে' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শাহরিয়ার কবিরের ভাষায়, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দানবসদৃশ প্রতিকৃতিসম্বলিত পোস্টারটি

আঁকার ভেতর শিল্পীর রূপকল্পনার গভীরতা ছিল, কলম ও তুলির দক্ষ আঁচড় ছিলো, কিন্তু সবচেয়ে বড় ছিলো শত্রুর প্রতি তার গভীরতম ঘৃণা ও ক্রোধ, যা তিনি প্রতিটি দর্শকের ভেতর সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ...এ যাবৎকালে যুদ্ধের যত পোস্টার আমরা দেখেছি এতটা ঘৃণাসঞ্চারী এবং ক্রোধ উদ্রেককারী দ্বিতীয়টি দেখিনি (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০০)।' এছাড়াও আরো অনেক পোস্টারের মাধ্যমে এদেশের চিত্রশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

গণহত্যা : শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, ড্রইং, ১৯৭১

অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচার ও নৃশংস গণহত্যার চিত্র আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে চিন্তামনি কর ও কামরুল হাসানের নেতৃত্বে

প্রদর্শনী আয়োজিত হয় ভারতের কলকাতায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছরে, বাংলাদেশের অসংখ্য শিল্পী নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে, মুক্তিযুদ্ধ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন। এর কোন সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত তালিকা করা হয়নি, হয়তো সেটা খুব সহজসাধ্যও নয়। তবে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অজস্র শিল্পকর্ম দেখানো হয়েছে এবং নানা সময়ে অসংখ্য প্রকাশনায়, বিশেষ করে এক্সিবিশন ক্যাটালগে এসব শিল্পকর্মের ইমেজ মুদ্রিত হয়েছে। এই লেখায় কিছু নির্বাচিত শিল্পীর চিত্রকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং বিভিন্ন ধারার চিত্রকর্ম সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। সাধারণভাবে এই আলোচনা শুরু হতে পারে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে দিয়ে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা : শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কালি ও কলম, ১৯৭১

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এদেশের আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃৎ শিল্পী এবং দেশের যে কোন ক্রান্তিলগ্নে তাকে সক্রিয় হতে দেখা গেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কালপর্বেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আমরা ১৯৭১ সালেই জয়নুল আবেদিনের করা একটি ড্রইংয়ের বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। কালি-কলম ও ওয়াশে করা সাদা-কালো এই শিল্পকর্মটিতে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' নামের এই ড্রইংয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অদম্য শক্তি ও গতিশীলতা মূর্ত হয়েছে। লক্ষণীয়,

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের চিত্রকলায় তিনি ব্যবহার করেছিলেন সাধারণ মোটা কাগজ ও কালো রঙ। বলিষ্ঠ রেখায় তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কালো থাবায় সৃষ্ট মানব ইতিহাসের অন্যতম করুণ ও মর্মস্পর্শী অধ্যায়ের যে চিত্র রচনা করেছেন তা পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা লক্ষ করি, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি আবার ফিরে গেছেন সাদা-কালোয়, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষের অদম্য আগ্রহ ও ভালোবাসা সাধারণ মাধ্যম ব্যবহার করে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এছাড়াও, মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি হলে তার মূল কপিটির অলংকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকায় চারু-আন্দোলনে জয়নুল আবেদিনের সহযোদ্ধা পটুয়া কামরুল হাসান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। বলা চলে, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ–এই কালপর্বে তিনি নানাভাবে রং-তুলি হাতে সক্রিয় ছিলেন–যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি অজস্র শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন–এর মধ্যে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি নিয়ে করা পোস্টারটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী। কিন্তু এর বাইরেও তিনি যেসব শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন তার মধ্যে নারী-মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি সভ্যতার শক্তি তিনি অনুভব করেছেন নারীর মাধ্যমে। ১৯৭১ এর ঘটনা অবলম্বন করে ছবি আঁকতে গিয়ে বেশিরভাগ চিত্রকর নারীকে উপস্থাপন করেছেন দুঃখের প্রতীক হিসেবে, পাক-হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হিসেবে। কিন্তু কামরুল হাসান নারীকে এঁকেছেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। এর আগে যে নারী ছিল প্রেমিকা, সহোদরা কিংবা জননী সে এখন পরিণত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধায়। রহস্যময় রমণী মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় দেশকে ভালোবেসে হয়েছে গেরিলা যোদ্ধা।

সফিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের আরেক পথিকৃৎ শিল্পী, একাত্তরকে অনুভব করেছেন কিছুটা বিমূর্ত আঙ্গিকে। ‘একাত্তরের স্মৃতি’ শিরোনামে এনগ্রেভিংয়ে করা দুটি কাজে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের ‘চোখ’ ব্যবহার করেছেন তিনি প্রতীক হিসেবে। হালকা রঙে দৃঢ় রেখার ব্যবহারে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একধরনের বিষন্নতা। বিশুদ্ধ ধারার এই নাগরিক শিল্পীর একাত্তর নিয়ে করা কাজে প্রচ্ছন্ন বেদনা ও নস্টালজিয়া অনুভব করা যায়। তবে কি তিনি মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পর ১৯৮৮ সালে আঁকতে বসে কিছুটা স্মৃতিকাতর হয়েছিলেন বাঙালির এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে? নাকি কোন ব্যক্তিগত স্মৃতি বা সামষ্টিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে এই ছাপচিত্রগুলোতে?

এস এম সুলতান বাংলাদেশের আরেক কিংবদন্তি শিল্পী। বোহেমিয়ান স্বভাব ও বিচিত্র জীবনযাপনের কারণে তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক গল্প, অনেক মিথ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানায় বাংলার গ্রামীণ সমাজ–বিশেষ করে গ্রামের কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে–এইসব প্রান্তিক খেটে খাওয়া

মানুষের গল্প নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন শহুরে আধুনিকতা এবং বিশ্বাস করেছেন এই দেশ, এই সভ্যতার মূল শক্তি হলো গ্রামের কৃষকসমাজ। তিনি তাদের সংগ্রামী ও বীর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকতে বসেও তিনি সেই নিজস্ব বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি। তাঁর শিল্পকর্মে ফিগরগুলো যথারীতি পেশিবহুল এবং প্রেক্ষাপট গ্রামীণ। তাঁর কৃষক যখন যুদ্ধে যায় তাদের হাতে থাকে ঢাল ও বল্লম। আধুনিক অস্ত্র তিনি সচেতনভাবেই আঁকেননি। তাঁর এই অবস্থান তাঁকে নিজস্বতা দেয়–গ্রামীণ মানুষের প্রতি তাঁর পক্ষপাত নিশ্চিত করে। এছাড়াও তিনি একাত্তরের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। সেখানে সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যস্ত ফিগার। একাত্তরের দিনগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে বাঙালির জীবন কী রকম ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল–তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে এই শিল্পকর্মে।

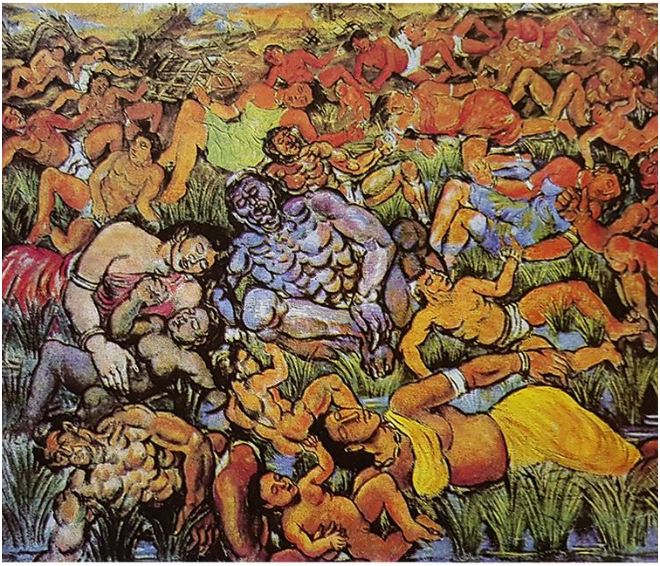

হত্যাযজ্ঞ : শিল্পী এস এম সুলতান, তেলরং

মোহম্মদ কিবরিয়া ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশের চারুকলার জগতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন মূলত বিমূর্ত ধারার চিত্রকর হিসেবে। একাত্তরে, ২৫ মার্চের কালো রাতে, মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে আসেন তিনি। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাঁর ক্যানভাসে প্রভাব ফেলেছিল। সুখের ছবি ও দুঃখের ছবি তিনি প্রচুর এঁকেছেন এর আগে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তাঁকে নিয়ে গেছে আরেক দিগন্তে–

যেখানে বিশেষ ধরনের কালো কিংবা লাল রঙের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই কালো হলো পোড়া, ছাই, অবক্ষয় কিংবা বেদনার অভিব্যক্তি। তাঁর লাল ঠিক আলোকিত লাল নয় বরং পুড়ে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া, দগ্ধ লাল। এ যেন ঘরবাড়ি, গ্রাম কিংবা শহরের পোড়া লাল–এ যেন মানুষের বিষন্ন আর্তনাদ।

আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের আধুনিক ধারার চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম। ষাটের দশকে তিনি ও তৎকালীন অনেক চিত্রকর বিমূর্ত ধারার ছবি আঁকতেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে আবার মানুষ আঁকার প্রেরণা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে আঁকা একটা কাজে দেখা যায়–একটা অপারেশন থিয়েটার, সেখানে আহত মানুষের চিকিৎসা চলছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে একটা সাধারণ ছবি মনে হতে পারে–কিন্তু আসলে এই অপারেশন থিয়েটার, ডাক্তার, রোগী–এগুলো সব রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের বর্বরতা এবং তা থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া বা মুক্তিযুদ্ধ–এই হলো শিল্পকর্মের বিষয়।

কাইয়ুম চৌধুরী বাংলাদেশের চিত্রকলার জগতে অত্যন্ত পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে তাঁর রয়েছে কিংবদন্তিসম জনপ্রিয়তা। বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিয়ে কোন বিতর্ক চলে না। ব্যাবহারিক শিল্পের বাইরে, তাঁর নিজস্ব শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে আরো প্রবল, আরো বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। এদেশের মুক্তিযুদ্ধ হলো একটি জনযুদ্ধ। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র–সবাই এতে অংশগ্রহণ করেছে। এই জনযুদ্ধের চেতনায় সাধারণ মানুষকে বীর ও উদ্যমী যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করেছেন তিনি। লুঙ্গি পরা খালি গায়ে মাথায় লাল গামছা বেঁধে অস্ত্র হাতে যে মানুষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে–তার কথা কেউ মনেও রাখেনি। কিন্তু কাইয়ুম চৌধুরীর ক্যানভাসে এই সাধারণ মানুষ, যে কিনা সময়ের প্রয়োজনে দেশ স্বাধীন করতে অস্ত্র হাতে নিয়েছে– সেই মানুষটিই নায়ক–মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চরিত্র। 'জয়বাংলা', 'মুক্তিযোদ্ধা', 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ' ইত্যাদি শিরোনামে তাঁর বেশ কিছু কাজ আছে– যেখানে দেখা যায় আধা-বিমূর্ত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি। লাল-সবুজ পতাকার উপস্থিতিও তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাজে প্রায়শই দেখা যায়।

মুর্তজা বশীর বাংলাদেশের আরেক গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক শিল্পী, একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। পার্টির নির্দেশে তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সক্রিয় ছিলেন বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে। একাত্তরের অভিজ্ঞতায় তিনি শহীদদের পবিত্র আত্মাকে ছুঁতে চেয়েছেন নিজের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। নুড়ি-পাথরকে অবলম্বন করে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর সিরিজ চিত্রকর্ম 'শহীদ শিরোনাম' বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত তিনি এই সিরিজ শিল্পকর্ম এঁকেছেন। বিমূর্ত ধারার এইসব চিত্রকর্ম প্রতীকধর্মী।

এছাড়াও রশীদ চৌধুরী ও দেবদাস চক্রবর্তী একাত্তর নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও চেতনা নির্ভর বেশ কিছু কাজ করেছেন। ১৯৭১ সালে রশীদ চৌধুরীর 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে করা এই কাজটিতে দেখা যায়, স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলার মানুষ ও পশুপাখি একসাথে পতাকা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তবে দেবদাস চক্রবর্তীর কাজ বিমূর্ত ধারার।

মুক্তিযোদ্ধা : শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, তেলরং, ২০০০

হাশেম খান ষাটের দশক থেকেই শিল্পী হিসেবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। যে ৬ দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল তার লোগো তৈরি করেছিলেন শিল্পী হাশেম খান। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চিত্রকর্মের একটা বড় প্রেরণা। তাঁর কাজে বিভিন্ন অবয়ব ও প্রতীকের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার তাঁর কাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

রফিকুন নবীর প্রাথমিক খ্যাতি ছিল জলরং মাধ্যমে। এছাড়া তিনি ছাপচিত্রে ও পেইন্টিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কার্টুনিস্ট হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা আছে। তাঁর সৃষ্ট 'টোকাই' এক অসামান্য চরিত্র। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং ঢাকায় থেকে বিভিন্ন ভাবে গেরিলা যোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাজে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে বিভিন্নভাবে। বিশেষ করে বধ্যভূমির স্মৃতি তাঁর কাজে ফিরে ফিরে আসে।

প্রাণেশ মন্ডল, যিনি ১৯৭১ সালে কলকাতায় প্রবাসী সরকারের আর্ট ও ডিজাইন বিভাগে কাজ করতেন, তিনিও পোস্টার আঁকার পাশাপাশি নানা মাধ্যমের শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকেছেন। পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে ধর্ষিত নারীদের নিয়ে তাঁর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তবে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের চিত্রকর্ম নিয়ে কথা বলতে গেলে শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের কথা অবধারিতভাবে মনে পড়ে। তৎকালীন আর্ট কলেজের ছাত্র শাহাবুদ্দিন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে, রং-তুলি ফেলে গভীর দেশাত্মবোধ থেকে সক্রিয়ভাবে অস্ত্র হাতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। অতঃপর দেশ স্বাধীন হলে আবার শিল্পকলার জগতে ফিরে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁকে সব সময় অনুপ্রাণিত করেছে এবং এই চেতনা থেকে তিনি পরবর্তীকালে যেসব ছবি এঁকেছেন তাতে বারবার বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টি নানাভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর কাজে 'গতিশীলতা' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিল্পকর্ম নির্মাণে তিনি একাত্তরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি স্বতন্ত্র শিল্প শৈলী তৈরি করেছেন—যা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে।

এছাড়াও চন্দ্রশেখর দে, মনসুর-উল-করিম, স্বপন চৌধুরী, কালিদাস কর্মকার, কাজী গিয়াস, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ শিল্পীসহ আরো অজস্র

ফ্রীডম ফাইটার্স : শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, তেলরং, ২০০০

শিল্পী মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, একাত্তরের অভিজ্ঞতা ও চেতনাকে ভিত্তি করে নানা ধরনের শিল্পকর্ম রচনা করেছেন।

এমনকি, প্রাতিষ্ঠানিক এসব শিল্পী ছাড়াও, ঢাকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের রিকশাচিত্রীরা মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে অসংখ্য শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। এসব শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা ও এই সংক্রান্ত নানা অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, পাকিস্তান বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি সংঘাত, ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ইত্যাদি। রাজকুমার দাস, আলী নুর, পিসি দাস, আলাউদ্দিন এই জনপ্রিয় ধারার গুরু শিল্পী। এখনো বাংলাদেশে সৈয়দ আহমদ হোসেন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, আবদুল মালেক প্রমুখ কাজ করে চলেছেন। রিকশা পেইন্টিং নিয়ে একটা বড় আয়োজন হয়েছিল ১৯৯৯ সালে ঢাকার ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আলিয়ঁস ফ্রঁসেসে। এই প্রদর্শনীর কিছু শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্তু করে কাজ করা হয়েছিল–যা এখন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত হচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একদিনে হঠাৎ করে ঘটেনি–বরং এর নিজস্ব ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে। ১৯৪৭ এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ভাষার প্রশ্নে প্রথম বিরোধিতা এবং ক্রমশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করেছে। আমরা লক্ষ করি, দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ঢাকায় যে চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তা ক্রমশ এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গিয়েছে–এবং একে অপরকে উজ্জীবিত করেছে, সহযোগিতা করেছে। কিংবা ব্যাপারটাকে এভাবেও বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এই দুইয়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে চারুশিল্পীদের যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান আছে। একই সাথে, বাংলাদেশের চারুকলার একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিত্তি করে। বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক আবুল মনসুর যথার্থই বলেছেন, 'তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের স্বাভাবিক চরিত্রলক্ষণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চিতি ছাড়াও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের দীর্ঘ চব্বিশ বছর লড়াই করতে হয়েছে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক দমননীতির বিরুদ্ধে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে এদেশের শিল্পী সম্প্রদায়কে

সৃজনশীল সৃষ্টিকর্ম নির্মাণের পাশাপাশি বাঙালির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার নস্যাতের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। জনগণকে সজাগ ও সচেতন করবার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ সাংস্কৃতিক সংগ্রামে চারুশিল্পীদের ভূমিকা ছিল সম্মুখসারিতে এবং উনসত্তরের গণজাগরণ সৃষ্টির উদ্দীপনা রচনায় তাঁরা পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তুলি ও অস্ত্র হাতে লড়েছেন শিল্পীদের অনেকেই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যান্য সংস্কৃতি-কর্মীর সঙ্গে চারুশিল্পীরাও পালন করেছেন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা (সেলিম, ২০০৭, পৃ. ৫৮)।'

এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে নতুন প্রাণের জোয়ার, নতুন সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল তাতে নতুন নতুন শিল্পশৈলী যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি গত পাঁচ দশকে নবীন-প্রবীণ অসংখ্য শিল্পী মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নানা মাধ্যমে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন–যা বাংলাদেশের চারুকলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

হক, সৈয়দ আজিজুল (১৯৯৮), *কামরুল হাসান জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি

ইসলাম, আমিনুল (২০০৩), *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বশীর, মুর্তজা (১৪০৮ বঙ্গাব্দ) *মুর্তজা বশীর : মুর্ত বিমূর্ত*, চট্টগ্রাম : পূর্বা

আজিম, ফয়েজুল (২০০০), *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, নজরুল (১৯৯৫), *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

-(১৯৯৭), *জয়নুল আবেদিন*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

সেলিম, লালারুখ (সম্পা.) (২০০৭), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

মনসুর, আবুল (১৯৮৭), *শিল্পী, দর্শক, সমালোচক*, ঢাকা : মুক্তধারা

-(২০০৩), *রশীদ চৌধুরী*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

জামান, মাহমুদ আল (২০০২), *সফিউদ্দিন আহমেদ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

হক, মফিদুল (২০০৩), *কাইয়ুম চৌধুরী*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

খান, সাদেক (২০০৩), *এস এম সুলতান*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

সরকার, কমল (১৯৮৪), *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা : যোগমায়া প্রকাশনী

সোম, শোভন (১৯৯৮), *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, দিল্লি : প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয় ভারত সরকার

ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪), *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী

দাস, গৌতম (২০০০), *বাংলার শিল্প চর্চার উত্তরাধিকার*, কোলকাতা : পুনশ্চ

আকন্দ, শাওন (২০০৪), *বাংলাদেশের আধুনিক চারুশিল্পের প্রবণতা*, ঢাকা : ইম্প

ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল এবং চৌধুরী, সুবীর (সম্পাঃ) (১৯৯৫), *এস. এম. সুলতান স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

আশরাফউজ্জামান, শরীফ (১৯৯৭), *কিংবদন্তীর ক্যানভাসে এস. এম. সুলতান*, নড়াইল : বর্ণছাপ প্রকাশনী

চৌধুরী, সুবীর (সম্পাঃ) (১৯৯৩), *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

হাই, হাসনাত আবদুল (২০০০), *সুলতান*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯১)

-(২০০৪), *মুর্তজা বশীর*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

খালেদ, মইনুদ্দিন (২০০০) *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, (প্রথম প্রকাশ ১৯৮১)

মুরশিদ, গোলাম (২০০৬), *হাজার বছরের বাঙ্গালি সংস্কৃতি*, ঢাকা : অবসর

আলী, মতলুব সম্পাদিত, *রূপবন্ধ*, ঢাকা : অজানা

মুকুল, এম আর আখতার (১৩৯১ বঙ্গাব্দ), *পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা : অজানা

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.) (২০০৭), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩)

কামরুল হাসান (২০১০), *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আজিজুল হক, ঢাকা : প্রথমা

প্রবন্ধ/পত্র-পত্রিকা/মাল্টিমিডিয়া সিডি

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৪), 'জয়নুল আবেদিন', *নিসর্গ ও মানবের গাথা : জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন*, ঢাকা : বেঙ্গল ফাউন্ডেশন

আকন্দ, শাওন (২০০৮), 'জয়নুল আবেদিনের একটি অপ্রকাশিত চিঠি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', *শিল্পরূপ*, সম্পা : নীলিমা আফরিন, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

- (২০০৯), 'ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা', *শিল্পরূপ*, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

- (২০০৯), 'ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা', *শিল্পরূপ*, নীলিমা আফরিন সম্পাদিত, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

খালিদ, সৈয়দ আবদুল্লাহ (২০০৫), *সাপ্তাহিক ২০০০*, শাহাদাত চৌধুরী সম্পাদিত, (বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৪), ২৫ মার্চ

৮০ বছরে জীবন শিল্পী ইমদাদ হোসেন (২০০৫), ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, ঢাকা : প্রকাশকের নাম নেই

দৈনিক আজাদ, ১৬ আগস্ট ১৯৫৫

আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট অব বাংলাদেশ (২০০৮) মাল্টিমিডিয়া সংস্করণ, ঢাকা : রাখালবালক

বাংলাপিডিয়া (২০০৬), মাল্টিমিডিয়া সংস্করণ, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি